অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 52-60
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.007

NIRBACHITA RABINDRANATAKE LOKOSANSKAR O LOKACHAR / নির্বাচিত রবীন্দ্রনাটকে লোকসংস্কার ও লোকাচার

DR. SALEHA KHATUN / ড. সালেহা খাতুন
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মগরাহাট কলেজ
Email: saleha19794@gmail.com

Accepted: 04.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords: লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, লোকাচার, বন্ধন, প্রতিবাদ, মুক্তি

Abstract:
বাংলা সাহিত্য ও নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অসামান্য। তাঁর নাটকে কেবল কাব্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি বাংলার গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের প্রতিফলনও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে নির্বাচিত কয়েকটি রবীন্দ্রনাটকের আলোকে লোকজ ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গ্রামীণ জীবনের সংস্কারসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের চরিত্র, সংলাপ ও ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে লোকসমাজের মানসিকতা, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের চিত্র ফুটে উঠেছে। এতে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ লোকজ উপাদানকে শুধু ঐতিহ্য হিসেবে নয়, বরং সমাজের ভাবনা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর নাটকে লোকসংস্কৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক ও সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। এই প্রবন্ধে সেই দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাটকে লোকজ সংস্কৃতির উপস্থিতি ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

Discussion:

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন ধারার মধ্যে নাটক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যকর্মে কাব্যিক সৌন্দর্য ও কল্পনার প্রকাশের পাশাপাশি সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের গভীর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিশেষত বাঙালি সমাজের লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের প্রভাব তাঁর বহু নাটকে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। লোকসংস্কার ও লোকাচার মূলত সমাজের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক আচরণের সমষ্টি, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। গ্রামীণ সমাজে এগুলোর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলোর মধ্য দিয়েই একটি জাতির সংস্কৃতি, মানসিকতা ও ঐতিহ্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলার এই লোকজ ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন লোকসংস্কৃতির মধ্যেই বাঙালি সমাজের প্রকৃত জীবনচেতনা নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে এই লোকজ সংস্কারের বিভিন্ন দিককে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কোথাও তিনি লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় সংস্কারকে নাটকের কাহিনি ও চরিত্র গঠনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, আবার কোথাও সেগুলির সামাজিক তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতাকেও তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর নাটকগুলিতে যেমন লোকজ জীবনের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি সমাজচেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও লোকাচার কেবল নাটকের পটভূমি নয়, তা নাটকের ভাব, বিষয়বস্তু ও চরিত্রচিত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি নাটকে একদিকে যেমন বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতিও সমালোচনামূলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই প্রবন্ধে নির্বাচিত রবীন্দ্রনাটকে লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি এসব উপাদান কীভাবে নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও ভাবধারাকে প্রভাবিত করেছে এবং এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, তা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। তার আগে লোকসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিবিড় আন্তরিকতার পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নেবো।

লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর ও আন্তরিক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, গ্রামবাংলার মানুষের জীবনধারা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, গান, গল্প ও প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেই বাঙালি জাতির প্রকৃত সংস্কৃতির শিকড় নিহিত। তাঁর গান, কবিতা, গল্প ও নাটকে বাংলার লোকজ সুর, ভাব ও জীবনবোধের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায় লোকজীবন সম্পর্কে তিনি কখনোই অজ্ঞ ছিলেন না। বিশেষ করে তাঁর 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধটি পড়লেই আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি যে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি কতটা বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তাঁর আগে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে লোকসংস্কৃতির তেমন কোনো মূল্য ছিল না। তাঁরা লোকসংস্কৃতির প্রতি তেমনভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অনেকেই এর যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথই প্রথম লোকসংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করেন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজকে সচেতন করে তোলেন। তাঁর প্রভাবেই পরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মননে লোকসাহিত্য চর্চার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়। তবে এটাও সত্য রবীন্দ্রনাথের আগে লোকজ উপাদান যে একেবারেই সংগ্রহ করা হয়নি, তা বলা অসমীচীন। কিছু প্রচেষ্টা অবশ্যই ছিল, কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই ছিল বিদেশি গবেষক বা সংগ্রাহকদের উদ্যোগে। সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ এই কাজকে বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে

.

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। লোকসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগের পরিচয় আরও বেশি করে পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্যে লোকজ উপাদানের প্রয়োগের মাধ্যমে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'সাধনা' ও 'প্রবাসী'-তে লোকসাহিত্য সম্পর্কিত নানা আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। 'ছেলেভুলানো ছড়া' (১৩০১) তার মধ্যে অন্যতম সংকলন। এছাড়া 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হারামণি' বিভাগে তিনি বাউল সাধক লালন ফকিরের গান প্রকাশ করেন, যা বাংলার লোকসংগীতকে শিক্ষিত সমাজের কাছে নতুনভাবে পরিচিত করে তোলে। শুধু তাই নয়, শিলাইদহ, শান্তিনিকেতনসহ বাংলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ জীবন, লোকসংস্কৃতি ও দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পরে তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। জানা যায়, লোকজ উপাদান সংগ্রহের কাজে তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'ছেলেভুলানো ছড়া' সংকলনের ভূমিকাতেই তিনি এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি শুধু লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তা নয়, বরং সেই ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজেও নিজেকে সরাসরি যুক্ত করেছিলেন। তবে তিনি যে একা এই কাজ করেছিলেন তা নয়, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষের উপর তিনি ছড়া সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

লোকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও লোকাচার। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, চিন্তা-ভাবনা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই এগুলির বিকাশ ঘটে। কিন্তু যখন কোনো বিশ্বাস সমাজের গণ্ডি অতিক্রম করে অন্ধভাবে বাস্তবে প্রয়োগ হতে শুরু করে, তখন তা ধীরে ধীরে সংস্কারে পরিণত হয়। এই সংস্কার কখনো শুভ হতে পারে, আবার কখনো অশুভও হতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রতিটি সমাজই মনে করে তাদের নিজস্ব সংস্কারগুলোই কল্যাণকর এবং অন্য সমাজের সংস্কারগুলো অকল্যাণকর। ফলে বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া অনেক সংস্কার ক্রমে যুক্তিবিবর্জিত অন্ধ কুসংস্কারে পরিণত হয়। এই ধরনের লৌকিক সংস্কার কীভাবে মানুষের বিশ্বাসকে অতিক্রম করে বাস্তব জীবনে অন্ধ কুসংস্কারের রূপ ধারণ করেছে, তারই গভীর ও তীক্ষ্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে। প্রথাগত সংস্কার শুধু অতীত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আজও তার প্রভাব আমাদের সমাজজীবনে বিদ্যমান। সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময় ধর্মশাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করে না; তারা মূলত মোক্ষলাভ বা পরকালীন কল্যাণের আশাতেই ধর্মীয় আচারে অংশগ্রহণ করে। এই সুযোগেই যুগে যুগে পুরোহিততন্ত্র ধর্মের নামে নানা প্রথা ও আচার সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে। সময়ের প্রবাহে সেই আরোপিত প্রথাগুলোই সংস্কারের রূপ নিয়ে সমাজে স্থায়ী হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, পণ্ডিত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—অনেকেই কোনো যুক্তি বা বিশ্লেষণ ছাড়াই গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই সংস্কারগুলো অন্ধভাবে পালন করে চলেছে।

এই ধরনের অন্ধ ধর্মীয় প্রথার মধ্যে বলিদান প্রথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের দৃষ্টিতে এটি এক অভিশপ্ত কুপ্রথা, যা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজও অনেক জায়গায় আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। বলিদানের পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়—মানুষ তার মনের যাবতীয় অমঙ্গল ভাবনাকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই বলিদান প্রথা মানুষের সহমর্মিতা ও মানবিকতার পরিপন্থী। কারণ সব ধর্মের মূল শিক্ষা হলো সকল জীবের প্রতি প্রেম ও সেবা প্রদর্শন করা। যে স্রষ্টা এই জীবজগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি কীভাবে তাঁরই সৃষ্ট জীবের প্রাণনাশে আনন্দিত হতে পারেন—এই প্রশ্নটি অনেক সময় মানুষ ভেবে দেখেই না। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি জীবের প্রতি তিনি সমানভাবে স্নেহশীল—এই মানবিক বোধই প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা। যদিও শাক্তধর্মের পদাবলী এবং মুসলিম ধর্মীয় আচারের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বলিদান প্রথা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, তবুও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পূজার নামে বা পুণ্যের নামে কোনো জীবকে হত্যা করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা একপ্রকার বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের মনে এই বলিদান প্রথাকে কেন্দ্র করে যে গভীর

কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে, সেই কুসংস্কারের মূল ভিত্তিতেই তীব্র আঘাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জন' নাটকে। যদিও এর আগে আমরা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১) নাটকে বলিদান প্রথার প্রসঙ্গ পেয়েছি। সেখানে বাল্মীকিকে বলতে শোনা যায় –

"বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে—
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা,
বলি নিয়ে আয়!" (১ম দৃশ্য) [১]

যদিও এই ঘটনাটি পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত, তবুও নাটকের পরিণতিতে দেখা যায় বাল্মীকির অন্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই বলিদান কার্য সম্পন্ন হয়নি। দস্যুবৃত্তি থেকে তাঁর আত্মমুক্তির মধ্য দিয়েই মানবিকতার বিজয় ঘটে। এখানেই বোঝা যায়, বলিদান প্রথা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিরাগ কতটা গভীর ছিল। এই বিরাগ যেন তাঁর মনে এক ধরনের মানসগ্রন্থির মতোই স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই ১৯৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার কালীঘাটে বলি প্রথা নিবারণমূলক অনশনে তিনি উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। [২] আসলে রবীন্দ্রনাথ কখনোই অসামাজিক বা অন্যায়মূলক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেননি। বরং সমাজে যেখানে অন্যায় ও অবিচার দেখেছেন, সেখানে তিনি তাঁর সাহিত্য ও লেখনীর মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আসলে সেই সময় সমাজে প্রথানির্ভর ধর্মীয় উন্মাদনা এতটাই প্রবল ছিল যে মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ বা মানবিক চেতনা জাগ্রত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার মানুষের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই পরিস্থিতির এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই 'বিসর্জন' নাটকে। সেখানে ধর্মীয় আচার ও বলিদান প্রথাকে কেন্দ্র করে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, ক্ষমতার লোভ এবং মানবিকতার সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন—ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কুসংস্কার নয়, বরং মানবিকতা, প্রেম এবং সহমর্মিতার বিকাশ।

নাট্যসাহিত্যের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত নাটকগুলোর তুলনায় পরবর্তী সময়ের নাটকগুলো অনেক বেশি পরিণত ভাবনা ও শিল্পরূপে সমৃদ্ধ। এই পরিণত রচনাগুলোর অন্যতম নিদর্শন হলো 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪)। এই নাটকে সমাজজীবনের নানা বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং গ্রামীণ লোকাচারের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জাতিভেদমূলক মানসিকতার চিত্রায়ন। রঘুর কন্যাকে 'অনার্যা' ও 'অশুচি' বলে অভিহিত করার মধ্যে সেই সময়কার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক সংকীর্ণতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ধর্মের নামে মানুষ যে কত সহজেই মানবিকতার সীমা অতিক্রম করে অন্য মানুষকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করতে পারে, নাট্যকার এখানে সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন। তবে নাটকটি কেবল সামাজিক কুসংস্কার বা সংকীর্ণতার চিত্রই তুলে ধরেনি, এর মধ্যে গ্রামীণ সমাজের লোকাচার ও প্রথারও বাস্তব প্রতিফলন রয়েছে। পঞ্চদশ দৃশ্যে দেখা যায় রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রাজবাড়িতে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কিছু রীতিনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের বিয়েতে মুড়ি-মুড়কি বিলোনোর যে গ্রামীণ রীতি বা লোকাচার রয়েছে, তার কথাও নাটকে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে রাজবাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানে ডুগডুগি বাজানোর যে বিশেষ প্রথা বা আচার ছিল, তারও উল্লেখ করা হয়েছে –

"প্রথম পুরুষ।। ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে।
দ্বিতীয় পুরুষ।। তা তো জানি।
তৃতীয় পুরুষ।। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।
চতুর্থ পুরুষ।। রাজার বাড়ি নবৎ বসেছে, কিন্তু ভাই আমাদের ডুগডুগি না বাজলে আমোদ হয় না।

তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগডুগি বাজিয়েছি।

স্ত্রীলোক।। হ্যাঁ গা, রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে, তা মুড়িমুড়কি বিলোনো হবে না ?

প্রথম পুরুষ।। দূর মাগি, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়কি বিলোনো হয় ? গুড়, ছোলা চিনির পানা"[৩]

উপরিউক্ত সংলাপের মাধ্যমে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক রীতিনীতির একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে দেখা যায়, গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের বিয়ের অনুষ্ঠানে যেখানে মুড়ি-মুড়কি বিলোনো একটি প্রচলিত লোকাচার, সেখানে রাজবাড়ির বিবাহ অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন কিছুটা আলাদা ও আড়ম্বরপূর্ণ। অর্থাৎ একই সমাজের মধ্যেই শ্রেণিভেদ অনুসারে রীতিনীতির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে একদিকে যেমন ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সামাজিক গোঁড়ামির চিত্র তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজের লোকাচার, প্রথা ও সংস্কৃতিরও বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ফলে নাটকটি কেবল একটি কাহিনিনির্ভর রচনা নয়, বরং এটি সেই সময়কার সমাজজীবনের বিশ্বাস, সংস্কার ও লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ হলো 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটক। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমাজে প্রচলিত অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং যুক্তি, মানবিকতা ও সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। নাটকটির মূল উদ্দেশ্যই হলো দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রোথিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে ভেঙে মানুষের মধ্যে মানবিক বোধ ও মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটানো। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র পুরোহিত রঘুপতি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের প্রতীক। দেবীর নামে বলিদান প্রথাকে তিনি ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন এবং সেই বিশ্বাসকে অটুট রাখতে সমাজকে ক্রমাগত প্রভাবিত করতে থাকেন। কিন্তু নিজের এই অন্ধ বিশ্বাস যে সমাজের উপর কতটা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে, তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে তাঁর ধর্মান্ধতা সাধারণ মানুষের মনেও অন্ধ কুসংস্কারের জন্ম দেয় এবং সমাজকে এক বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে। অন্যদিকে রঘুপতির বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য। তিনি মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং বলিদান প্রথার কঠোর বিরোধিতা করেন। দেবীর পূজার নামে নির্বিচারে জীবহত্যা যে প্রকৃত ধর্মের পরিপন্থী, সেই সত্যটি তিনি সমাজের সামনে তুলে ধরতে চান। জনগণকে সচেতন করার জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্পে ঘোষণা করেন—

"আমার ত্রিপুর রাজ্যে যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।" [৪]

রাজার এই ঘোষণা ছিল বহুদিনের লালিত ধর্মীয় সংস্কারের উপর এক প্রবল আঘাত। সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বলিদান প্রথাকে হঠাৎ করে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। ফলে রানী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, চাঁদপাল ও নয়নরায়—প্রত্যেকেই রাজার এই সিদ্ধান্তে সন্দিহান হয়ে পড়ে। এমনকি মন্ত্রীর মনেও প্রশ্ন জাগে মানুষের শত বছরের লালিত প্রথা 'সেকি পাপ হতে পারে?' আসলে তাদের প্রত্যেকের মন ধর্মান্ধতার অন্ধকারে এতটাই আচ্ছন্ন যে সত্য ও মানবিকতার আলো তাদের চেতনাকে স্পর্শ করতে পারে না। তারা ধর্মের বাহ্যিক আচারকে সত্য বলে মনে করে, কিন্তু ধর্মের অন্তর্নিহিত মানবিক বোধকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

নাটকের শেষ পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ এক গভীর মানবতাবাদী সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেবতার প্রতি অন্ধ ভক্তির চেয়ে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতাই যে প্রকৃত ধর্ম—এই বোধকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যই তিনি জয়সিংহের মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, অনেক সময় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর মুক্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই ধারণা তাঁর অন্যান্য নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন প্রায়শ্চিত্ত, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী ইত্যাদি। এসব রচনায়ও তিনি দেখিয়েছেন যে মানবমুক্তি অনেক সময় ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের

মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়। দীর্ঘদিনের লৌকিক সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস মানুষের মনে এত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে তা ভাঙার জন্য এক গভীর অভিঘাত প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই জয়সিংহের মৃত্যু নাটকে এক অনিবার্য পরিণতি হয়ে ওঠে। বাহ্যিকভাবে এটি একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি হলেও, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করা। অর্থাৎ জয়সিংহের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে মানবিকতার বিজয় এবং কুসংস্কারের পরাজয় প্রতীকীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে নাটকের সূচনাতেই লোকবিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রানী গুণবতী সন্তান লাভের আশায় দেবীর কাছে মানত করেন যে তিনি প্রতি বছর একশো মহিষ ও তিনশো ছাগ বলি দেবেন। এই ঘটনাটি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কারের একটি বাস্তব প্রতিফলন। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দেবতার কাছে মানত করা এবং সেই মানতের সঙ্গে বলিদানের মতো প্রথাকে যুক্ত করা—এইসব আচারের মধ্য দিয়েই সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাটকে একদিকে যেমন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, বলিদান প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও যুক্তিবোধের গুরুত্বকে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে নাটকটি সমাজের কুসংস্কারমুক্ত চেতনার আহ্বান এবং মানবতাবাদের এক শক্তিশালী দলিল হয়ে উঠেছে।

লোকবিশ্বাস ও অন্ধ কুসংস্কারের আরেকটি গভীর চিত্র ফুটে উঠেছে 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পকৌশলে দেখিয়েছেন কীভাবে অন্ধ বিশ্বাস মানুষের চিন্তা, শিক্ষা ও জীবনকে অবরুদ্ধ করে রাখে। নাটকের শুরুতেই একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সংকীর্ণ বিশ্বাসের ভয়াবহতা প্রকাশ পায়। আশ্রমের ক্ষুদ্র বালক সুভদ্র আয়তনের উত্তর দিকের তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বন্ধ থাকা জানালাটি খুলে দেয়। এই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে সমগ্র নাটক জুড়ে এক গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আশ্রমবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আয়তনের উত্তর দিকটি একজটা দেবীর অধিকারভুক্ত। তাই সেই দিকের জানালা খুলে কেউ বাইরে তাকালে তার চোখ সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে যাবে। এই অদ্ভুত কুসংস্কার আশ্রমবাসীদের মনে এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল যে তারা সেটিকে অমোঘ সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। এমনকি মহাপঞ্চক বালকদের ভয় দেখিয়ে বলেছিল, উত্তর দিকের জানালা খুললে তা 'মাতৃহত্যার পাপ'-এর সমান গুরুতর অপরাধ হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বালক সুভদ্র জানালাটি খুলে বাইরে তাকালেও তার চোখ পাথর হয়ে যায়নি। তবুও আশ্রমবাসীদের অন্ধ বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তারা বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে নিজেদের কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন। আচার্য ও পঞ্চক ছাড়া আশ্রমের প্রায় সকলেই সুভদ্রকে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাতামস ব্রত পালন করানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের ধারণা ছিল, এই কঠিন ব্রত পালন করলে সুভদ্রের পাপ মোচন হবে। এই ঘটনার ফলে সুভদ্রের মনে ভয়ের ছায়া নেমে আসে। ছোটবেলা থেকেই তার মনে এমনভাবে ভয় ও পাপের ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সে নিজের করা 'অপরাধ'-এর কথাও মুখে উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিল না। তখন পঞ্চক বালকদের মন থেকে ভয় দূর করার জন্য নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা তাদের শোনায়—

> "পঞ্চক। ...ও মাসের শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়াল কাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি। ...তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।" [৫]

কিন্তু পঞ্চকের এই যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞতা শোনানোর পরেও বালকদের মনে গেঁথে থাকা ভয় ও কুসংস্কার দূর হয়নি। কারণ ভয় থেকে বড়ো বিষয় ছিল তাদের মনে গড়ে ওঠা অন্ধ বিশ্বাস। ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে এমনভাবে নানা ধরনের ধর্মীয় ধারণা ও কুসংস্কার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সেই সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে তারা সহজে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আশ্রমের বালকদের মধ্যে আরও নানা ধরনের লোকবিশ্বাস প্রচলিত ছিল। তাদের

বিশ্বাস ছিল—পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রের দিনে কাকিনী সরোবরের নৈঋত কোণ থেকে ঢোড়া সাপের খোলস সংগ্রহ করে, সেই খোলসের সঙ্গে কালো ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল বেঁধে তা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে সেই ধোঁয়ার গন্ধ পিতৃপুরুষেরা গ্রহণ করলে ভয়ানক পুণ্য লাভ হয়। এই ধরনের অদ্ভুত বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় আশ্রমের বালকেরা কোনটি পাপ আর কোনটি পাপ নয় তা বিচার করতে শেখেনি; তারা কেবল পুণ্য অর্জনের আশাতেই নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে শিখেছে। ছোটবেলা থেকেই পণ্ডিতেরা তাদের মনে এই বিশ্বাসগুলো গেঁথে দিয়েছিলেন। এছাড়াও নাটকে শোনপাংশু ও দর্ভকদলের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের লোকবিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবে নাটকের পরতে পরতে এই বিশ্বাসগুলিকে ভেঙে দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে অন্ধভাবে কোনো বিশ্বাসকে গ্রহণ করা উচিত নয়; বরং যুক্তি ও বোধের আলোয় সবকিছু বিচার করা প্রয়োজন।

নাটকের পটভূমি যে আচলায়তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানে প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় আচার ও নিয়মকানুনের কঠোর অনুশাসনের মধ্যেই শিক্ষাদান করা হয়। আশ্রমবাসীদের বিশ্বাস ছিল, বাইরের আলো ও বাতাস ভিতরে প্রবেশ করলে বালকদের শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটবে। তাই পুরো আয়তনটিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল, যাতে বাইরের জগতের কোনো প্রভাব ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু আমরা জানি, রবীন্দ্র দর্শনের মূলকথা হলো—বন্ধন ভেঙে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। তাই নাটকের শেষ পরিণতিতে দাদাঠাকুর শোনপাংশুদের সঙ্গে নিয়ে সমস্ত উঁচু-নিচু ভেদাভেদ দূর করে দেন এবং প্রাচীন আচার-অনুশাসনের কঠোর বন্ধন ভেঙে দেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি আচলায়তনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে মুক্তির আলো প্রবেশ করান। এইভাবে 'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মানবমুক্তির এক উজ্জ্বল বার্তা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, সত্যিকারের শিক্ষা সেই যা মানুষকে অন্ধ অনুশাসনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মুক্ত চিন্তা, যুক্তিবোধ ও মানবিকতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) নাটকেও অন্ধবিশ্বাস, লোকসংস্কার এবং সাধারণ মানুষের ধর্মীয় মনস্তত্ত্বের এক বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিশেষত 'রথের রশি' নাটিকা অংশে স্ত্রী চরিত্রদের সংলাপের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় রথযাত্রার মেলায় মহাকালের রথ অচল হয়ে পড়ে আছে। রথের এই অচল অবস্থাকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। সাধারণ মানুষ এই ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে বিচার না করে নানা রকম অলৌকিক ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকে। এই নাটকে স্ত্রী চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। রথের রশি অচল হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তারা সহজেই নানা ধরনের লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে পড়ে। তাদের মনে ধারণা যে রথের দড়ি যেন কোনো দেবশক্তির প্রতীক, যা মানুষের পূজা ও ভক্তি প্রত্যাশা করছে। রথের দড়িকে অচল অবস্থায় দেখে দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটি বলে—

"দ্বিতীয়া : বুঝেছি আমাদের পুজো নেবেন ব'লে
হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।
পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট" [৬]

এই সংলাপের মধ্যে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার একটি স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে দড়ির মতো একটি জড়বস্তুকেও দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। এটি আসলে মানুষের অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক, যা লোকসমাজে বহুলভাবে প্রচলিত।

আবার এই ঘটনার প্রভাবে জনতার মধ্যেও নানা ধরনের আশঙ্কা ও কুসংস্কার জন্ম নিতে থাকে। প্রথম নাগরিকের মনে হয় দড়ির রঙ যেন নীল হয়ে উঠেছে, যা তাদের কাছে কোনো অলৌকিক সংকেতের মতো মনে হয়। বিশেষ করে নারীদের মন আবেগপ্রবণ ও সহজেই প্রভাবিত হওয়ার কারণে তারা অল্পতেই ভয় ও কুসংস্কারে

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশা বা অমঙ্গলকেও তারা এই অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু করে। যেমন প্রথমা বলে—

"প্রথমা : এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,
তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।
দ্বিতীয়া : ...এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা মুড়িয়ে চুল দেব ফেলে।
তৃতীয়া : এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুধু রুটি।
বলো না ভাই, সবাই মিলে—জয় দড়ি নারায়ণের জয়
প্রথমা : ...মরণকালে ঐ দড়ি-ধোওয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।
দ্বিতীয়া : গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজুবন্ধ
দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে" [৭]

এই সংলাপগুলিতে নারীদের মানসিকতার একটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি বা পারিবারিক বিপর্যয়কেও এই অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে এবং সেই কারণে তারা বিভিন্ন মানত বা প্রতিজ্ঞা করতে থাকে। কেউ মাথা মুড়িয়ে চুল উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করছে, কেউ ভাত ত্যাগ করে নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণের সংকল্প করছে, আবার কেউ মৃত্যুকালে দড়ি ধোওয়া জল মাথায় দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। এমনকি কেউ দড়ির ডগায় সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়ার কথাও বলছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রভাবে মানুষের যুক্তিবোধ অনেক সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তারা জড়বস্তুকেও দেবতার মর্যাদা দিতে দ্বিধা করে না। এছাড়া নাটকে অন্ধভক্তি ও কুসংস্কারের আরেকটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটি একটি লোকবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলে—

"দ্বিতীয়া : তিনকড়ির মা বললে সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে,
ঠিকদুক্ষুর বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে
তালপুকুরের-ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—
এক ডুবে তিন গোছা পাঠ-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে, প্রভুর টনক নড়বে।
প্রথমা : ...আমার দেওরপোর পেট-রোগা, কী জানি কিসের থেকে কী হয়।
দ্বিতীয়া : তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা।" [৮]

এই অংশে লোকসমাজে প্রচলিত নানা ধরনের মন্ত্র, তন্ত্র এবং অলৌকিক বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে নির্দিষ্ট কিছু আচার পালন করলে বা বিশেষ কোনো পদ্ধতিতে পূজা করলে দেবতার অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব। ফলে তারা যুক্তি বা বাস্তবতার পরিবর্তে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করতে শুরু করে। এইভাবে 'কালের যাত্রা' নাটকের স্ত্রী চরিত্রদের সংলাপে অহেতুক ভয়, অন্ধবিশ্বাস, সংস্কারান্ধতা এবং অন্ধভক্তির প্রকাশ ঘটেছে। তবে কেবল নারীরাই নয়, নাটকের পুরুষ চরিত্রদের মধ্যেও বিস্ময়, ভীরুতা ও কুসংস্কারের পরিচয় লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমাজের সামগ্রিক মানসিকতার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

Reference:

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (১ম খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃষ্ঠা – ১৪
২। চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', (৩য় পর্যায়) দে'জ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা – ২২২
৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (১ম খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃষ্ঠা – ১১৭
৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বিসর্জন' 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (১ম খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃষ্ঠা – ২৬৪
৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'অচলায়তন' 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (১ম খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃষ্ঠা –৮০৫
৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'কালের যাত্রা' 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (২য় খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃষ্ঠা – ৫৬৮
৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রথের রশি' 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (২য় খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃষ্ঠা – ৫৭১
৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রথের রশি' 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (২য় খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃষ্ঠা – ৫৭৯-৫৮০

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

১। ঘোষ শঙ্খ, 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', দে'জ, কলকাতা, ১৯৬৯
২। ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৬১
৩। বিশি প্রমথনাথ, 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ ২০২০

পত্রিকা :

১। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, সম্পাদক মিত্র সনৎকুমার, সার্ধশত জন্মবর্ষ : রবীন্দ্রনাথ : লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, ১ ম সংখ্যা, বৈশাখ – আশ্বিন ১৪১৭